জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

ঘূর্ণিঝড় রিমালের আঘাতে বেড়িবাঁধ ভেঙে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের গ্রামগুলি প্লাবিত হয়ে ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, যার কারণে অনেকে নিঃস্ব হয়ে বাঁধের উপর আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।
ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ও দ্রুত বাঁধ মেরামত না হওয়ায় এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ভিটেমাটি হারিয়ে জীবিকা সংকটে পড়েন। অনেকেই তাদের বসতভিটা হারিয়ে স্থায়ীভাবে বাঁধের উপর খুপরি ঘর তৈরি করে বসবাস করতে বাধ্য হন। বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের পানখালী গ্রামের আমিরন বিবি তার স্বামী এবং চার সন্তান নিয়ে খুলনা শহরে আশ্রয় নেন। সুন্দরবনের কারণে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় রিমালের হাত থেকে বড়ো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহত হওয়া থেকে উপকূলবাসী রক্ষা পেলেও টানা দুই দিনের ঝড়-বৃষ্টিতে আমিরন বিবি তার খুপরি ঘরসহ সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কয়েক দিন বাঁধের উপর খোলা আকাশের নিচে থেকে জমানো সামান্য কিছু টাকা নিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসেন খুলনা শহরে।
দশ বছর আগে ১৪-১৫ বছরের কিশোরী আমিরন বিবি’র সাথে বিয়ে হয় একই গ্রমের ২১ বছরের নজরুলের সাথে। বিয়ের পর থেকেই আমিরন বিবি’র শাশুড়ি ও স্বামী কারণে অকারণে নানারকম অপবাদ দিতো। তখন আমিরন বিবি’র মনে হতো সব সমস্যার জন্য সে নিজেই দায়ি। শাশুড়ি গত হয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে, পরপর চার সন্তানের জন্ম,আর্থিক দুরবস্থা সব মিলিয়ে তাদের বস্তির জীবন খুবই কষ্টে কাটে। তারপরও ভুলতে পারে না পানখালী গ্রামের কথা।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বের ১০৯টি দেশের ৬৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ১১০ কোটি মানুষ চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ভুগছে। সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি মানুষ যা মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ। খরা, বন্যা, তাপপ্রবাহ বা বায়ুদূষণের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কেউই এখন পুরোপুরি নিরাপদ নয়। কিন্তু সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই এর সবচেয়ে কঠিন প্রভাবের শিকার। সাহারার দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষ দারিদ্র্যের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। চরম তাপমাত্রা, খরা, বন্যা ও বায়ুদূষণ-এই চারটি জলবায়ু ঝুঁকির কারণে এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ অভিবাসন একটি আলোচিত কিন্তু জটিল বিষয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের জন্য এটা আরও বেশি

নিলে সুফল পাওয়া যাবে।তাদের কর্মসংস্থান, খাদ্যনিরাপত্তা এবং বাসস্থনের ব্যবস্থা করতে হবে। শহর ও গ্রামে উভয় জায়গায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য গুরুত্বসহকারে সমানভাবে কাজ করতে হবে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মধ্যে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের মতো ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী রয়েছে। সবার জন্য এক রকম সমাধান কার্যকর হবে না,প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে হবে। সমস্যাগুলো কম-বেশি আমরা সবাই জানি,সমাধানের পথও আমাদের জানা আছে, দরকার শুধু আন্তরিকতা, প্রস্তুতি এবং সদিচ্ছা।
লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ

মানবিকতা একটি জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। শুধু প্রযুক্তি, অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই একটি দেশকে উন্নত করে না। বরং মানুষের মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা,সহানুভূতি না থাকে, তাহলে সেই উন্নয়ন অনেকাংশেই অর্থহীন। একটি মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে আগে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শিখতে হবে। উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন তার ভেতর মানবিকতা থাকে। তাই “মানবিক বাংলাদেশ” গঠন আজ সময়ের দাবি। মানবিকতা মানে শুধু দয়া-সহানুভূতি নয়; এটি হলো মানুষে মানুষে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে সবাইকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করাই মানবিকতার প্রকৃত রূপ।

সব ধর্মেই মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বলে, “যে ব্যক্তি একজন মানুষকে বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাল।” অন্যান্য ধর্মও মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা দেয়। তাই মানবিক বাংলাদেশ মানে ধর্মীয় মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগ। তবে শুধু গণতন্ত্র,অর্থনৈতিক উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রয়োজন একটি মানবিক বাংলাদেশ যেখানে মানুষে মানুষে ভালবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ থাকবে। বাংলাদেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। যে দেশে মানুষ মানুষকে সন্মান করবে, মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত হবে। যে দেশে কোন যুবক বেকার থাকবেনা। সকলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। মিথ্যা শঠতা থাকবে না; থাকবে না অন্যকে অসম্মানিত না করা। নারী সে শিক্ষার্থী হোক বা কর্মজীবী হোক সবক্ষেত্রে সেজেনো নিরাপদ অনুভব করে;সেই

স্বপ্নের দেশ চাই। এর জন্য প্রয়োজন দেশের সকল জনগণের সচেতনতা,সহযোগিতা ও সমর্থন ।

আমরা চাই মানবিক বাংলাদেশ। মানবিক বাংলাদেশ হবে এমন এক দেশ, যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে; গরীব-ধনী, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই সমান সম্মান সমহিমায় পাবে; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সকলের জন্য নিশ্চিত হবে; পথশিশু, অসহায় ও প্রতিবন্ধীরা সুযোগ পাবে স্বাভাবিক জীবনের; সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িবোধ থাকবে প্রতিটি নাগরিকের মাঝে;ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে বসবাস করবে।

একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে দেখা যাবে না। আমাদের সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সহানুভূতির অভাব দেখা দিচ্ছে, তা রোধ করতে হলে সামাজিক মূল্যবোধকে আবার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, ও মানবিকতা শেখাতে হবে। বাবা-মা ও অভিভাবকদের নিজেদের আচরণেও মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। গণমাধ্যমকে মানবিকতা বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বোপরি, আমাদের প্রত্যেককে নিজের দায়িত্বে মানবিক আচরণ করতে হবে।

শুধু উন্নয়ন নয়, আমরা চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ যেখানে মানুষের মধ্যে থাকবে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্মানবোধ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিপর্যায়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের প্রত্যেককে আগে মানুষ হতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ছিল। পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি। অল্প কথায় কী অপূর্ব সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘোষণা!

রাষ্ট্র যেসব সুবিধা তার নাগরিকদের দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, এই হলো সাম্যের সহজ মানে। অর্থাৎ আপনার আর আমার সামাজিক অবস্থান-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা আলাদা হতেই পারে, কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের আলাদা চোখে দেখবে

না, বরং রাষ্ট্রের সুবিধাদি পাওয়ার অধিকার আমাদের সমান থাকবে। সামাজিক ন্যায়বিচার মানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের সমবণ্টন। আর মানবিক মর্যাদা মানে মানুষ হিসেবে আপনার-আমার সম্পূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার অধিকার। মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণ বারবার আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান আর চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দুটো মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বাতিঘর, যেকোনো সংকটে মুক্তিযুদ্ধই আমাদের পথ দেখাবে। সুতরাং, এই মুহূর্তের করণীয় হলো, স্বাধীনতার ঘোষণার কাছে ফিরে যাওয়া। মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-দেশ-রাষ্ট্র এসব কিছুর মালিকানা জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই এখনকার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটা কথা মনে রাখা দরকার, সাম্য না থাকলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘকালের অপশাসনে আমাদের সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্যই এত অস্থিরতা চারদিকে, এত বিকার, এত উগ্রতা।

জনগণের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে গণঅভ্যুত্থান অবশ্যই শক্তিশালী একটি মাধ্যম। আমেরিকান তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সমালোচক আভ্রাম নোয়াম চমস্কির ভাষায়, ‘যখন একটি সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন গণঅভ্যুত্থান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।’ গণঅভ্যুত্থানের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সব সময় একইরকম নাও হতে পারে। এর মধ্যদিয়ে জনগণ তার ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একটি পরিবর্তন আনার সংগ্রামে মিলিত হয়। তবে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য জনগণের সমর্থনের পাশাপাশি সঠিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। অন্যথায় তা প্রায়শই বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতায় পর্যবসিত হয়। জনসমর্থন হচ্ছে এর শক্তির দিক, দিশাহীনতা হচ্ছে দুর্বলতার দিক।

একটা বিষয় মনে রাখা দরকার তা হলো, প্রজন্ম ও প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো স্থির বিষয় নয়; যুগে-যুগে প্রজন্মের রুচি-রূপ এবং দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। কিন্তু ইতিহাস তার জায়গায় ঠিকই থেকে যায়, থেকে যায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই ক্ষমতার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। যার মধ্যদিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অর্থে বৈষম্য নিরসন করে সাম্যের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে মানবিক রাষ্ট্র গঠনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরাষ্ট্র

অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ থেকে বাঁচতে করণীয়

গ্রিক শব্দ অ্যানথ্রাক্স (Antharx) এর বাংলা তড়কা রোগ এবং আভিধানিক অর্থ কয়লা। এটি ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস বা ব্যাসিলাস সেরিয়াাস বায়োভার অ্যানথ্রাসিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। ১৮৭৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রোবের্ট কচ প্রথম অ্যানথ্রাক্স এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেন। তবে তারও পূর্বে ১৭৫২ সালে বিজ্ঞানী মারেট এবং ১৭৬৯ সালে বিজ্ঞানী ফোর্নিয়ার ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের প্রথম ক্লিনিকাল বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর পূর্বে এটি ছিলো কেবলই ঐতিহাসিক বিবরণ। এ বিরল রোগটি মানুষের ক্ষেত্রে আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি মহাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় দক্ষিণ ইউরোপে বেশি দেখা যায়। উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এ সংক্রমণ অস্বাভাবিক। বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে দুই হাজার টি সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। এ সংক্রমণ সাধারণত ত্বকের সংস্পর্শ, শ্বাস- প্রশ্বাস বা অন্ত্রের শোষণের মাধ্যমে ঘটে। এ রোগে সংক্রমিত হওয়াার একদিন থেকে দুই মাসেরও বেশি সময় পরে লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। ত্বকে একটি ছোটো ফোস্কা দেখা যায় যার চারপাশে ফোলাভাব থাকে; যা প্রায়শই কালো কেন্দ্রবিন্দুসহ ব্যথাহীন আলসারে পরিণত হয়। জ্বর, বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম উপসর্গ। এছাড়াও, এ সংক্রমণে ডায়রিয়া (যার মধ্যে রক্ত থাকতে পারে), পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমিও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, অ্যানথ্রাক্স মূলত ব্যাকটেরিয়া জনিত গবাদি পশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যায়। এরোগটি গরুর ডাকমিনা, ধাস ও ধড়াস নামেও পরিচিত। সাধারণত ক্ষুরাযুক্তপ্রাণী যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। গবাদিপশুতে এ রোগের মৃত্যুর হার শতভাগ। আক্রান্ত বা মৃতপশুর সংস্পর্শে আসা মানুষেরও অ্যানথ্রাক্স হওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে এ রোগের জীবাণু মাটিতে প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্ত অবস্থায় ‘স্পোর’ নামক একপ্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশে সক্রিয় হয়ে গবাদি পশুকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই একবার কোথাও দেখা দিলে পরবর্তীতে বারবার সে এলাকায় এ রোগ

দেখা দিতে পারে। নিম্ন জলাভূমি, নদীর পাড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে এর প্রকট প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। সে হিসেবে আমাদের দেশে সাধারণত সিরাজগঞ্জ,মেহেরপুর, পাবনা,রাজবাড়ি, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় এ রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে চলতি বছরে সংক্রমণ দেখা দেয় রংপুরের বিভিন্ন উপজেলায় এবং উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুও ঘটে। গণমাধ্যমের বদৌলতে জানা যায় ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে এ সংক্রমণে ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়।

গ্রীষ্মের শুরূ থেকে বর্ষাকাল (মার্চ-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত, খরা মৌসুমের পরে হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে এবং বন্যার পরের সময়ই সাধারণত সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ সময়কাল। সংক্রমিত পশু-খাদ্য যেমন- ঘাস, কচুরিপানা ইত্যাদি;অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত মৃত পশুকে খোলা স্থানে ফেলে রাখলে শকুন, কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি শবাহারী প্রাণি; কখনো কখনো মাছি এবং অ্যানথাক্স আক্রান্ত মৃত পশু পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গেলে হাড় থেকেও পশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে। আক্রান্ত বা মৃত পশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া, পশম বা নাড়ি-ভুঁড়ির সংস্পর্শ, আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়া, পশুর চামড়া এবং অন্যান্য উপজাত (হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে সাধারণত মানুষে এটি ছড়ায়। মূলত অ্যনথ্রাক্স আক্রান্ত পশুর মাংস কাটার সময় মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। পশু জবাই করা, সেটির মাংশ কাটাকাটি করা এবং মাংস ধোয়া বা রান্নার সময় অনেকক্ষণ মাংস, রক্ত ও হান্ডির সংস্পর্কে থাকতে হয়। সে সময় আক্রান্ত পশুর রক্তের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে অ্যানথ্রাক্স। মাংস কাটাকাটির সময় মানুষের শরীরের চামড়ায় কোনো রকম ক্ষত থাকলে তার দেহে অ্যানথ্রাক্সের জীবানু প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমাদের দেশে পশুর অ্যানথ্রাক্স হলেও অনেক সময় তা জবাই করে মাংস কম দামে বিক্রি করে ফেলা হয়। ঐ মাংস কাটাকাটি করার সময় অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়া সম্ভাবনা থাকে। তবে পশু থেকে মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হলেও মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হয় না।

পশুতে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণগুলো হচ্ছে- আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যাওয়া,নাক, মুখ ও পায়ুসহ শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে রক্তক্ষরণ এবং বের হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা,প্রচন্ড জ্বর (প্রায় ৪০-৪২০ সে./১০৪-১০৭০ ফা:),শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া, জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা, মাংস পেশীর কম্পন,

প্রাথমিকভাবে অস্তিরতা বা উত্তেজনা কাজ করলেও পরবর্তীতে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও দাঁত কটকট করা, খিঁচুনি ও কাঁপুনি, সাধারণত ২-২৪ ঘন্টার ভেতর মারা যাওয়া এবং এক দিনের বেশি বেঁচে থাকলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় (জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি) পানি জমে যাওয়া। পশুর দেহে মৃত্যুর পরবর্তী লক্ষণগুলোর মধ্যে মৃত পশুর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে, নাক, মুখ, প্রসাব ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হওয়া, মৃতদেহ শক্ত না হওয়া এবং অতি তাড়াতাড়ি পচন শুরু হওয়া অন্যতম। আর মানুষে অ্যানথ্রাক্স রোগটি সাধারণত তিনটি রূপে দেখা যায়। যথা-ত্বকের অ্যানথ্রাক্স, পরিপাকতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স ও শ্বাসতন্ত্রেও অ্যানথ্রাক্স। এর মধ্যে ত্বকের অ্যানথ্রাক্সই বেশি দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসার ৩-১০ দিনের মধ্যে এ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছে-প্রথমে চামড়ায় লালচে দাগ হয়, আক্রান্ত স্থান চুলকায় ও ফুলে উঠে, পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থানে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারের ফোসকা উঠে, ফোসকার মাঝখানে পচনের মত কালচে দাগ হয়ে ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্টি হয়; তবে সাধারণত জ্বর থাকে না।

পশুর ক্ষেত্রে অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসায় প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিগুণ মাত্রার পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। অতিতীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। মানুষ থেকে মানুষে অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়না, কিন্তু মানুষের শরীর এবং পোশাক অ্যানথ্রাক্স জীবাণু বহন করতে পারে। শরীর থেকে জীবাণু দূর করার জন্য ব্যাকটেরিয়া নিরোধক সাবান দিয়ে গোসল এবং গোসলের পানি ব্লিচিং বা কোনও ব্যাকটেরিয়া নিরোধক দ্বারা শোধিত করা এবং জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত জিনিসপত্র ৩০ মিনিটের অধিক সময় ধরে ফুটাতে হবে। কোনো কোনো জায়াগা থেকে জীবাণু ধ্বংসে ক্লোরিন ব্লিচিং কার্যকরী নয়; বরং এক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড ব্যবহার করা উচিত। আক্রান্ত বাক্তির কাপড় পুড়িয়ে ফেলা জীবাণু ধ্বংসের একটি কার্যকর পদ্ধতি। মানুষ আক্রান্ত হবার পর যত দ্রুত সম্ভব অ্যানথ্রাক্স জীবাণুনাশক দিতে হবে; যত দেরি হবে জীবনের ঝুঁকি তত বাড়বে। মানুষের জন্য অ্যানথ্রাক্স টিকা প্রথম ১৯৫৪ সালে বাজারে আসে। ত্বকের অ্যানথ্রাক্স সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অসুখ। তবে সময়মত চিকিৎসা না করালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এ রোগের চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে।

ও মৃত্যু ফাঁদ হতে রক্ষা পেতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, গবাদিপশু খামারি, কসাই, ভোক্তাদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা উচিত।

লেখক: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস খাগড়াছড়ি

জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে উপকূলীয় নারী

উন্নত বিশ্বের নারী যখন মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য নভোচারী প্রশিক্ষণ করছে, তখন আমার উপকূলের কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারী সন্তান প্রসবের জন্য ২ ঘণ্টার নদী পথ পাড়ি দেওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন; সুস্থভাবে বাচ্চার জন্ম হবে তো! তিনি নিজে বাঁচবেন তো! নাকি অন্যদের মতো প্রসব-পরবর্তীকালীন জটিলতা বয়ে বেড়াবেন আজীবন। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা আজ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীসমাজ- বিশেষত গর্ভবতী, দুগ্ধদায়ী মা ও কিশোরীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুপেয় পানির সংকট, অপুষ্টি ও মানসিক চাপ তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের ১৯টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, লক্ষিপুর, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিচ্ছে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক স্থানে পানযোগ্য পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নারীর মৌলিক চাহিদার ওপর।

পরিবারে পানির যোগান, রান্না, সন্তান লালন-পালন ও দৈনন্দিন গৃহকর্মে প্রধান ভূমিকা পালন করেন নারীরা। ফলে পানির সংকট, খাদ্যাভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত তারা সরাসরি বহন করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন লবণাক্ত পানি পান করার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, প্রসূতি জটিলতা, ত্বকজনিত রোগ ও কিডনি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা সমভূমির নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি পান করলে প্রি-এক্লাম্পসিয়া ও এক্লাম্পসিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগ দেখা দিতে পারে, যা মা ও নবজাতকের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া লবণাক্ত পানিতে গোসল করার কারণে অনেক নারীর ত্বক পুড়ে যায়, চুল পড়ে যায় এবং চুলকানিসহ নানা চর্মরোগে ভোগেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লবণাক্ত মাটি ও পানির কারণে ধান, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন কমে গেছে। ফলে খাদ্যে বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে অপুষ্টি। অপুষ্টি নারীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে রক্তশূন্যতা ও অকাল বার্ধক্য দেখা দিচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানির অভাব এখন একটি বড়ো স্বাস্থ্যঝুঁকি। লবণাক্ত পানির কারণে টিউবওয়েল ও পুকুরের পানি প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ছে। নারীরা প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করে। এই পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, শরীরিকচাপ এবং ভারি জলের পাত্র বহন করার ফলে কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা, এমনকি গর্ভপাতের মতো জটিলতা দেখা দেয়। এছাড়া, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের পর যখন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়, তখন পর্যাপ্ত টয়লেট ও স্যানিটেশন না থাকায় নারীদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদা দুটিই হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় মেয়েরা রাতে টয়লেট ব্যবহারের ভয়ে পানি না খেয়ে থাকে, ফলে তাদের প্রস্রাবের সংক্রমণ ও কিডনি সমস্যা দেখা দেয়।

জলবায়ু বিপর্যয়ে নারীরা শারীরিক ও মানসিক দু‘দিক থেকে বড়ো আঘাত পায়। ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, রোয়ানু বা আম্পানের পর বহু নারী তাদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও প্রিয়জন হারিয়েছে এবং দুর্যোগে বহু পুরুষ শহরমুখী শ্রমবাজারে চলে যায়, ফলে তখন তাদের কাঁধে পড়ে পরিবার টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব। এ চাপ, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার কারণে অনেক নারী হতাশায় ভোগেন। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের মধ্যে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ও ট্রমাজনিত মানসিক ব্যাধির হার ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ পর্যায়ে

□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□-□□□□□□ □□□, □□□□ □□□ □ □□□□-□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ (Women Climate Forum) □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ “Standing Orders on Disaster (SOD)”—□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ Community Mental Health Programme □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□—□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ UNDP, WHO □ FAO—□□ □□□□□□□ □□□□ “Health Adaptation to Climate Change in Bangladesh” □□□□□□□□ Green Climate Fund (GCF) □ World Bank—□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ “Coastal Embankment Improvement Project (CEIP)”—□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□—□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□-□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

(২০২১–২০২৫) নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজনকে অন্যতম কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP 2023) উপকূলীয় নারীদের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারী-কেন্দ্রিক নীতি অপরিহার্য। নারী কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো অভিযোজন কৌশল সফল হতে পারে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়- বর্তমানের একটি কঠিন বাস্তবতা। এর প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় নারীদের জীবনে। তারা প্রতিদিন লড়ছেন দারিদ্র্য, লবণাক্ততা, অপুষ্টি, সুপেয় পানির সংকটের সাথে, অন্যদিকে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করছে।

তবে, নারীরাই আবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক। যতদিন তারা দৃঢ় মনোবলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, ততদিন উপকূল টিকে থাকবে জীবনের আশায়। এই সংগ্রামকে টেকসই করতে হলে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজন। কেননা, উপকূলের নারী শুধু ভুক্তভোগী নয়-তিনি পরিবর্তনের অগ্রদূত। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি, সরকারি পদক্ষেপ ও স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগগুলো ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে।

লেখক: সহাকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

ডেঙ্গুর বাড়াবাড়ি রুখতেই হবে

হাসপাতালের এক কোণে ছোট্ট মেয়েটা জ্বরে কাঁপছে। মায়ের চোখে ঘুম নেই, হাতে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট। প্লেটিলেট দ্রুত নেমে যাচ্ছে। পাশের বেডে আরও দু’জন রোগী। কারও শরীরে স্যালাইন চলছে। কেউ বমি সামলাচ্ছে। সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে এমন দৃশ্যই এখন

প্রতিদিনের বাস্তবতা। পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে উদ্বেগজনক সংবাদ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবেই আছে এ বছরের শুরু এই পর্যন্ত ডেঙ্গু সংক্রমনের সংখ্যা ৫১ হাজারের বেশি, এই সময়ের ভেতর মারা গেছেন ২১৭ জন। প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার রোগি আর মৃত্যুবরণ করা রোগির সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সি তরুণরা। যারা মারা গেছেন, তাদের মধ্যে শিশু-কিশোর ও তরুণদের সংখ্যাই বেশি। সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী শহরাঞ্চলে আক্রান্ত ও মৃত্যুর অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও এবছর গ্রাম-বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ছে বলে সতর্কবার্তা আছে।

ডেঙ্গু জ্বর ডেঙ্গু ভাইরাসের কারণে হয়, যা এডিস মশার কামড়ে ছড়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে মারাত্মক রোগের তালিকায় রেখেছে। বর্ষা শুরু হলেই ডেঙ্গু জ্বরের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। এই সময়ে ডেঙ্গুর মশা খুব বেশি সক্রিয় হয় এবং এর কামড় থেকে ডেঙ্গু জ্বর হয়। প্রচন্ড জ্বর, অনেক বেশি দুর্বলতা, শরীর ব্যথা, গাঁটে ব্যথা হয়ে অবস্থা নাজেহাল করে তোলে। সাধারণ জ্বরের তুলনায় ডেঙ্গু অনেক বেশি বিপজ্জনক, কারণ এর মৃত্যুহার প্রায় ১.৩%। সময়মতো চিকিৎসা না নিলে শরীরে লোহিত রক্তকণিকা কমে যায়।

ডেঙ্গু একসময় “বর্ষার রোগ” বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু এখন এটি ঋতুর সীমানা ছাড়িয়ে এক ভয়াল জনস্বাস্থ্য সংকট হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সংবাদে যোগ হচ্ছে নতুন নাম, নতুন মৃত্যু। এমন এক বছর এটি, যখন প্রায় প্রতিটি পরিবারই কাউকে না কাউকে ডেঙ্গুর গ্রাসে হারিয়েছে বা হারানোর ভয় নিয়ে বেঁচে আছে। অথচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে পোস্ট দেখিনি তেমন একটা। মানুষের মাঝে উদ্বেগ নেই। চেনা মানুষের বিপদের সংবাদে কিংবা যখন নিজের ঘরে হানা দিচ্ছে মৃত্যুদূত, তখন অনুভবের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে উদ্বেগ। অথচ ভেবে দেখুন, এবছর ডেঙ্গুর প্রকোপ কিন্তু গত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। কেনো এমন হলো? ডেঙ্গুর এই বাড়াবাড়ি কারণ আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে।

অনেক সময় ধরে বৃষ্টি না থাকা বা হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হওয়া মশা বংশবিস্তারের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। বৃষ্টির পানি জমে থাকা স্থানগুলো মশার উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রকৃতি, শহর পরিকল্পনা, জলবায়ু এবং আমাদের অবহেলা মিলেমিশে তৈরি করেছে ডেঙ্গুবান্ধব বাস্তবতা। আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়েই কথা বলা উচিত

প্রথমে। কিছুদিন আগে রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল এরকম — Bangladesh Sees Worst Single-day Surge in Dengue Cases and Deaths This Year. বৃষ্টি মৌসুম দীর্ঘ হচ্ছে। বর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পানির মুক্ত চলাচল কমে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ গড়ে উঠছে জলাবদ্ধতা যেখানে মশার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে অনেক বেশি।

তাপমাত্রা বাড়লে ডেঙ্গু ভাইরাস মশার দেহে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মশার উড়ানের সময়ও বেড়ে যায়, যা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়িয়ে তোলে। আমেরিকার National Library of Medicine Gi AbjvBb Rvb©v‡j cÖKvwkZ Dengue Fever in Bangladesh: Rising Trends, Contributing Factors, and Public Health Implications শীর্ষক গবেষণাপত্রে বাংলাদেশে এবছরের ডেঙ্গুর প্রকোপের জন্য দায়ী করা হয়েছে তাপমাত্রার বৃদ্ধি, আর্দ্রতা বেশি হওয়ার মতো আবহাওয়াকে যা মশাদের ডিম পাড়ার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ বাড়ে। এছাড়াও শহরায়ন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে।

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, শহরগুলোর অবকাঠামো সব জায়গায় প্রস্তুত নয়। শহরকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে প্রস্তুত করার মতো দক্ষ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মতো ব্যর্থতা আমাদেরই। শহরের বাসিন্দারা ব্যবহৃত প্লাস্টিকসামগ্রীর মধ্যে জমে থাকা পানি ফেলার ব্যাপারে সচেতন নয়, ড্রেনের ভেতর পলিথিন ফেলছে অবলীলায়, মশারি ব্যবহারে আলসেমি। এবছর গ্রাম এলাকাগুলোও বাদ পড়েনি ডেঙ্গুর থাবা থেকে। প্রধান শহরগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামে গ্রামে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ স্বাস্থ্যসেবা, রোগ নির্ণয় ও দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ এখনো শহরের তুলনায় গ্রামে অনেক কম।

এবছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু যেমন বেশি, ডেঙ্গু থেকে সেরে ওঠার পর আবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও বেশি। ডেঙ্গু রোগের নকশা নাকি বদলে যাচ্ছে! এরকম ভয় ধরানো সংবাদ পড়েছিলাম দুই বছর আগে, Bangladesh Battles Record Dengue Deaths As Disease Pattern Changes শীর্ষক আলজাজিরার এক স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে। মৃত্যুর সংখ্যা বছর বছর বাড়ছে, এর পেছনে দায়ী এই নকশাও। কেউ একবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে সব ধরনের ডেঙ্গু ভাইরাস থেকে রক্ষাকবচ পেয়ে যান, ব্যাপারটা তেমন নয়। ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি ভিন্ন সেরোটাইপ রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সেরোটাইপের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হলেও, অন্য সেরোটাইপ দ্বারা আক্রান্ত হলে তা

মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। যারা একবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের দ্বিতীয়বার অন্য সেরোটাইপ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

এই দ্বিতীয় সংক্রমণটি অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে, কারণ এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় একটি “যুদ্ধংদেহী” প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা রক্তনালীকে ছিদ্রযুক্ত করে এবং আরও নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। সঙ্গতকারণেই যারা একবার আক্রান্ত হয়েছেন, তারা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আক্রান্ত হলে রোগের জটিলতা বেশি হয়। বর্তমানে নতুন সেরোটাইপ দেখা যাচ্ছে, যার কারণে ডেঙ্গু রোগীদের অবস্থা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে। এর সাথে আছে আমাদের জাতীয় চরিত্রগত সমস্যা— চিকিৎসায় সময়ক্ষেপণ। অনেক রোগী জ্বর-লক্ষণ দেখার পর বাড়তি দেরি করেছেন হাসপাতাল যেতে বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে। আমাদের স্বাস্থ্যসেবার নানা দুরবস্থার বাস্তবতাকেও এড়ানোর উপায় নেই। হাসপাতালে রোগিরা প্রাথমিক সেবা বা ফ্লুইড থেরাপি সময়মতো পান না। আছে চিকিৎসক সংকট, নার্স সংকট, চিকিৎসাসামগ্রীর সংকট।

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও মশার ওষুধ ছেটানোর বিষয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগকেও এড়ানোর উপায় নেই। ডেঙ্গু এখন শুধু একটি রোগ নয়— এটি বাংলাদেশের নগর পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও নাগরিক সচেতনতার পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রয়োজন সমন্বিত, টেকসই ও তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ। প্রথমত, নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত করতে হবে।

প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় মাসিকভাবে লার্ভা জরিপ চালানো বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে আগেভাগে সংক্রমণ প্রবণ অঞ্চল শনাক্ত হয়। ফগিং বা স্প্রে নয়, লার্ভা ধ্বংসের স্থায়ী ব্যবস্থা —যেমন ড্রেন পরিষ্কার, জমে থাকা পানি নিষ্কাশন ও নির্মাণস্থলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে বাস্তব পর্যায়ে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিক স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা যেতে পারে, যারা সপ্তাহে একদিন “পানি ফেলা অভিযান” পরিচালনা করবে। মিডিয়া প্রচারণায় কেবল ভয় দেখানো নয়, মানুষকে নিজের ঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রস্তুতি ও ডেটা-শেয়ারিং ব্যবস্থা উন্নত করা জরুরি। ডেঙ্গু প্রতিরোধকে সারা বছরের জনস্বাস্থ্য অগ্রাধিকার হিসেবে দেখতে হবে।

আপাততঃ আসুন, প্রত্যেকের জায়গা থেকে ব্যক্তিগত সচেতনতার মাত্রা বাড়ানোর কাজ করি। জ্বর হলে দ্রুত রক্ত পরীক্ষা ও প্লেটিলেট মনিটরিং করতে হবে, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে, বাড়িতে অনির্দিষ্ট ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। কী লক্ষণ দেখা গেলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে, জানা থাকতে হবে সবার। হঠাৎ উচ্চ মাত্রার জ্বর, সাথে তীব্র পেট ব্যথা, বারবার বমি, মুখ-নাক বা দাঁতের পাটি দিয়ে রক্ত পড়লে, বুকের ভেতর ব্যথা বা কষ্ট অনুভব করলে, হঠাৎ চেতনা হারালে দেরি না করে হাসপাতালে যেতে হবে। সময়মতো তরল গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণ রোগির জীবন রক্ষা করে।

আসুন, অসুস্থ হওয়ার আগে অসুস্থ হওয়া ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। বাসার আশেপাশের ছোটোবড়ো সব পাত্র ঢেকে রাখুন বা উল্টে রাখুন। স্থানীয়ভাবে নিজেদের এলাকা পরিষ্কার রাখতে পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করুন, সহযোগিতা করুন। ডেঙ্গুর বাড়াবাড়ি রুখতেই হবে আমাদের!

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকমুক্ত সচিবালয় : পরিবেশবান্ধব প্রশাসনের নতুন দিগন্ত

সরকারের স্বায়ত্তশাসিত একটি সংস্থার মহাপরিচালক শওকত হায়দার(ছদ্মনাম)। অন্যদিনের মতো আজও তিনি ভোরে উঠে ফ্রেশ হয়ে মর্নিং ওয়াক-গোসল ও সকালের নাস্তা সেরে পরিচ্ছন্ন পোশাকে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই দক্ষ মানুষ হিসেবে যেমন তাঁর পরিচিতি, অনুরূপভাবে পোশাক-পরিচ্ছদেও টিপটপ ব্যক্তি হিসেবে তার নামডাক বেশ। সকাল নয়টার আগেই রাজধানীর দিলকুশা এলাকায় অফিসের সামনে পৌঁছায় তাকে বহনকারী জিপ গাড়িটি। তবে বিপত্তি ঘটেছে এখানেই, গতকাল সন্ধ্যায় যে অল্প একটু বৃষ্টি হয়েছে, সেই পানি রাস্তা ও অফিস চত্বরে এখনও পর্যন্ত জমে রয়েছে।

অফিসে ঢুকতে হলে ড্রেন ও সুয়ারেজের ময়লায় একাকার এই কালো পানিতে পা ভেজানো ছাড়া অন্য উপায় নেই। ইচ্ছে না থাকলেও অফিস জুতো খুলে স্যান্ডেল পরে সে পথেই হাঁটতে হলো তাকে। পানি আর ময়লার পঁচা দুর্গন্ধে গা ঘিনঘিন করা অবস্থা হলো তখন। একটু পরে অবশ্য সিটি কর্পোরেশনের লোক এসে পানি অপসারণের ড্রেনের মুখ থেকে জমে থাকা কিছু পলিথিন সরিয়ে দিতেই সমস্ত পানি নিমিষেই নেমে গেল। জলাবদ্ধতার কারণটি ছোট্ট হলেও অফিসের সবার ভোগান্তি ছিল অনেক বড়ো।

ফেলে দেওয়া পলিথিন বা প্লাস্টিকগুলো নাগরিক জীবনে এরকম ছোটো- বড়ো বিপত্তির কারণ হয়ে উঠছে প্রতিনিয়তই। একসময়ে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পলিথিন বা প্লাস্টিক এখন পরিবেশ দূষণের উৎস ও জনজীবনে এক দুঃস্বপ্নের নাম। ব্যবহার শেষে প্লাস্টিক বর্জ্যের বড়ো একটি অংশ জমা হয় ভাগাড়ে, যেগুলো পচতে সময় লেগে যায় বছরের পর বছর। পরিবেশে প্লাস্টিকের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং বিধ্বংসী। একবার ব্যবহারযোগ্য পলিব্যাগ থেকে শুরু করে বহুবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিকপণ্য সবই পরিবেশের ক্ষয়ে ভূমিকা রাখে। এসইউপি বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার এখন সর্বব্যাপী, বিশেষ করে একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ, স্ট্র এবং বোতলের মতো দ্রব্যাদি। এর অপব্যবহার এবং ব্যবহৃত পলিথিনের ব্যবস্থাপনাগত ঘাটতির ফলে বিশ্বব্যাপী বাস্তুতন্ত্রের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়া একটি মোটামুটি পরিমাণে প্লাস্টিক বর্জ্যের গন্তব্য হচ্ছে জলাশয়গুলো, যার জের ধরেই ক্রমবর্ধমান সমুদ্র দূষণের সমস্যাটি আরও প্রকট হয়েছে। সমুদ্র যেন প্লাস্টিক বর্জ্যের এক বিশাল মজুদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এতে করে বিপর্যস্ত হচ্ছে সামুদ্রিক জীবন। জাতিসংঘের পরিবেশ প্রোগ্রামের (ইউএনইপি) পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, আট মিলিয়নেরও বেশি মেট্রিক টন প্লাস্টিক বর্জ্য প্রতিবছর সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। যা সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্য বিশাল হুমকিতে রূপ নেয়, কেননা তারা প্রায়ই ভুল করে প্লাস্টিককে খাবার ভেবে খেয়ে ফেলে অথবা বিভিন্নভাবে তাদের শরীর প্লাস্টিকের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, যা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্লাস্টিক বর্জ্যে মাটি দূষিত হয় এবং এতে থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের কারণে জীবজগৎ ও উদ্ভিদকূল উভয়েই ক্ষতির মুখে পড়ে। প্লাস্টিক দূষণের কারণে মাটির উর্বরতা ব্যাহত হয়, কৃষির উৎপাদনশীলতা কমে এবং বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতা বাধাগ্রস্ত হয়। এ

ধরনের বর্জ্য পুড়িয়ে নষ্টের চেষ্টা করলে তা পরিবেশে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ হয়ে মিশে যায়, যার ফলে বায়ু দূষণ ঘটে এবং পরবর্তীতে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগব্যাধির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্লাস্টিক দূষণের সবচেয়ে ভয়ের দিকটি হচ্ছে এর দীর্ঘস্থায়িত্ব। এর পচনে বহু বহু বছর লেগে যায় এবং বহু বছর পরও এটি ভেঙে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক নামের ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিকের আকার পাঁচ মিলিমিটারের চেয়েও কম এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু করে যে বাতাসে আমরা শ্বাস নিই-তার সবখানেই এখন মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই ছোটো ছোটো কণাগুলো খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির জন্ম দেয়।

প্লাস্টিকের জীবনচক্রের প্রথম ধাপ শুরু জীবাশ্ম জ্বালানি, অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে। এই অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোকে প্লাস্টিক উৎপাদনের কাঁচামাল, যেমন-ইথিলিন ও প্রোপিলিন পেতে ব্যবহার করা হয়। এই নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার ফলে বায়ু ও পানি দূষণ হয় এবং এর ফলে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাসের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বড়োসড়ো ঘটনা ঘটে। সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল বা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, প্রায় ৯৯ শতাংশ প্লাস্টিকই আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। শুধু ২০২০ সালেই বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক শিল্প থেকে ১.৮ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ গ্যাস বের হয়েছে, যা কি না ৩৮০টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্বন দূষণের সমান।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার সীমিত করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুরুতে ছিলো শপিংমলগুলোতে পলিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ। এ ব্যাপারে আইনের প্রয়োগসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা এখনও চলমান আছে। এর পাশাপাশি ঘোষণা দিয়ে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ে গত ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক বর্জন।এর আওতায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ফাইল-ফোল্ডারের পরিবর্তে কাগজ বা পরিবেশবান্ধব অন্যান্য সামগ্রীর তৈরি ফাইল ও ফোল্ডার ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কটন বা জুট ফেব্রিকের ব্যাগ ব্যবহার করা, প্লাস্টিকের পানির

বোতলের পরিবর্তে কাঁচের বোতল ও কাঁচের গ্লাস ব্যবহার, প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কটন ফেব্রিক, জুট ফেব্রিক বা বায়োডিগ্রেডেবল উপাদানে তৈরি ব্যানার ব্যবহার, দাওয়াতপত্র, ভিজিটিং কার্ড ও বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্রে প্লাস্টিকের লেমিনেটিং পরিহার করার পরামর্শও রয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন সভা- সেমিনারে সরবরাহকৃত খাবারের প্যাকেট যেন কাগজের তৈরি হয় বা পরিবেশ বান্ধব হয় সেটি নিশ্চিত করা। একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের প্লেট, গ্লাস, কাপ, স্ট্র, কাটলারিসহ সকল ধরনের পণ্য পরিহার, প্লাস্টিকের কলমের পরিবর্তে পেনসিল বা কাগজের কলম ব্যবহার, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল ধরনের প্রকাশনায় লেমিনেটেড মোড়ক ও প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিহার এবং ফুলের তোড়াতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত আছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সভায় সব মন্ত্রণালয়কে প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার সীমিত করা-সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, দর্শনার্থীদের কেউ যাতে এসইউপি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য প্রবেশপথে তল্লাশি করা এবং দর্শনার্থীদের কাছে প্লাস্টিকের ব্যাগ পাওয়া গেলে এর পরিবর্তে তাদের কাগজের বা কাপড়ের ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে সচিবালয়ের প্রবেশপথসহ বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক বোর্ড বসানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্লাস্টিকের থলের পরিবর্তে পাটজাত, কাপড় বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য থলে ব্যবহার করতে হবে। সরকারি কেনাকাটায়ও প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসইউপি ব্যবহার বন্ধে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে ব্যবহারের জন্য বিকল্প সামগ্রী সরবরাহ করা এবং সভা-সেমিনারে কাগজ বা পরিবেশবান্ধব খাবারের প্যাকেট দেওয়া হবে। সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন ফোকাল পারসন নিয়োগ ও মনিটরিং কমিটি গঠন করারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করা এসব প্লাস্টিকপণ্য বন্ধে অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করতে সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক বর্জনের উদ্যোগে সবার আগে এগিয়ে এসেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও তার অন্যতম

প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিদফতর। তথ্য অধিদফতরের অবস্থান সচিবালয়ের ভেতরেই। বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (এসইউপি) মুক্ত ঘোষণা করার ধারাবাহিকতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)-কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।এর আওতায় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক-এর ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিবর্তে নিম্নোক্ত প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশই বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করে। প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে ২০০২ সালে আইন করা হলেও গত ২২ বছরে তার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার সেই কাজে হাত দিয়েছে। এতদিন পরে এসে যখন বলা হয় পলিব্যাগের বিকল্প এখনো বাজারে নেই, তা কোনোভাবেই শতভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত কথা হলো, ২২ বছরেও আইনের প্রয়োগ না হওয়ায় প্লাস্টিকের বিকল্পও গড়ে ওঠেনি। স্বভাবতই আমরা প্লাস্টিকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। আইনের যথাযথ প্রয়োগহলে বাস্তবতার নিরিখেই প্লাস্টিকের বিকল্প গড়ে উঠবে। তখন সবাই প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য ব্যবহার করার সুযোগ পাবে ও সেক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যবাধকতা পালনও সহজ হবে। একটু ভেবে দেখা দরকার, আজ আমরা যেসব প্লাস্টিকগুলো বর্জ্য হিসেবে প্রকৃতিতে ফেলে দিচ্ছি, তার কোনো কোনোটি হয়তো আগামী ৪০০ বছরেও ধ্বংস হবে না।

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি (ইউএনইপি) তাদের বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী দিয়ে প্রতিদিন ৭৩ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য সাগরে মিশছে। এর ফলে সমুদ্রের তলদেশে যে হারে পলিথিন-প্লাস্টিকের স্তর বাড়ছে, তাতে আগামী ৫০ বছর পর সমুদ্রে মাছের চেয়ে পলিথিনের পরিমাণই হয়তো বেশি হবে। বাংলাদেশে প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার কী পরিমাণ বেড়েছে তার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) এবং বিশ্বব্যাংক। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী, ২০০৫ সালে দেশের শহরাঞ্চলে বছরে মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল মাত্র তিন কেজি, যেটি ২০২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে নয় কেজিতে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমানে শুধু রাজধানীতেই একজন মানুষের বছরে প্লাস্টিকের ব্যবহার ছাড়িয়েছে ২৪ কেজি। পুরো বাংলাদেশের হিসেব বিবেচনায় নিলে প্রতিবছর প্রায় এক কোটি টন পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে। যদি ও এ সব প্লাস্টিক-পলিথিনের মাত্র ৩৭শতাংশ রিসাইক্লিং করা সম্ভব হচ্ছে। পলিথিন এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই) সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৭তম। বৈশ্বিক প্লাস্টিক-পলিথিন দূষণের প্রায় আড়াই শতাংশ সৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশেই। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রকে প্লাস্টিক-পলিথিন মুক্ত করার যে শুভ উদ্যোগের শুরু হয়েছে, তার গুরুত্ব অশেষ। উদ্যোগটির বাস্তবায়ন সফল হলে পুরো দেশকে পলিথিন মুক্ত করার পথে আমরা আর ও একধাপ এগিয়ে যাব। বাংলাদেশ মুক্ত হবে এক পরিবেশগত মহা-হুমকি থেকে। তাই, উদ্যোগটির সফলতার প্রত্যাশা এখন সবার।

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই সমৃদ্ধি

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ এবং জাতির গৌরবের প্রতীক। এটি শুধু সুস্বাদু খাবার হিসেবেই নয় বরং দেশের অর্থনীতি, পুষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসে ইলিশ থেকে। যা প্রায় পাঁচ লাখ জেলে পরিবারের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। ইলিশ মূলত সমুদ্রের মাছ হলেও প্রজননের সময় মিঠাপানির নদীতে উঠে ডিম ছাড়ে। বাংলাদেশ সরকার মা ইলিশ সংরক্ষণের জন্য এসময় বিশেষ অভিযান চালায়। ইলিশ সংরক্ষণ সপ্তাহের দুটি রূপ রয়েছে। একটি হলো জাটকা সংরক্ষণয় সপ্তাহ (সাধারণত এপ্রিল মাসে) এবং অন্যটি হলো মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান (অক্টোবর মাসে)। প্রতিবছর এই সপ্তাহগুলো পালিত হয় ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এদের প্রজনন ও বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

এবছর ৪ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে ২৫ অক্টোবর এই ২২ দিন সারা দেশে নদ–নদীতে ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষা করতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন সময় বিবেচনায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিবছর আশ্বিন মাসের অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যবর্তী সময়কে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসময় সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, এই সময় ইলিশ আহরণের কোনো প্রকার লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। মৎস্য সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী অপরাধীদের এক থেকে দুই বছরের জেল এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

সরকারের ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নৌবাহিনী ১৭টি যুদ্ধজাহাজ দেশের বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করেছে। চাঁদপুর, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে বিশেষ নজরদারি চলছে। অভিযানে জাহাজ, ক্রাফট ও বোটসমূহ সার্বক্ষণিক টহলে নিয়োজিত, পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে অবৈধ মাছ শিকার প্রতিরোধে মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ব্যবহার করা হচ্ছে। নৌবাহিনী স্থানীয় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশ ও মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করছে।

মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রচারণায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন এবং দেশের মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এতে ইলিশের প্রজনন চক্র সুসংহত হয় এবং মোট উৎপাদন বাড়ে। ফলে দেশের অর্থনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয় তেমনি নদীনির্ভর জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তা তৈরি হয়। ইলিশ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কারণ এটি জনগণের জন্য অন্যতম পুষ্টিকর ও সহজলভ্য প্রোটিনের উৎস। মা ইলিশের জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার শুধু ইলিশ রক্ষা নয় বরং নদী ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখছে। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই উদ্যোগ আরও টেকসই হয়ে উঠছে। মূলত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মা ইলিশ সংরক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য।

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এই সময় ইলিশ ধরা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর নজরদারি চালায়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে

অর্থবছরে প্রায় ৬ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এই সাফল্য শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও প্রশংসিত হয়েছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ও অন্যান্য সংস্থা বাংলাদেশের ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের ফলে শুধু মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বরং উপকূলীয় নদী ও খাল-বিল অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যও সুসংহত হয়েছে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং নদী-নিবাসী পরিবেশ রক্ষা পেয়েছে। এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, সঠিক নীতি, আইন ও জনগণের অংশগ্রহণ মিলিয়ে টেকসই মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব।

মা ইলিশ সংরক্ষণ ও জাটকা রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধিন দপ্তর/সংস্থা বিশেষত তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেলা তথ্য অফিস, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, প্রেস ক্লাব, স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এই প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণকে মা ইলিশ ও জাটকা আহরণের নিষিদ্ধকাল, আইনগত বিধি এবং সচেতন আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। নদী তীরবর্তী এলাকায় মাইকিং, পোস্টার, ব্যানার, ভিডিও ক্লিপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্কুলভিত্তিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যাতে শিশু-কিশোর ও যুব সমাজও সম্পৃক্ত হয়। সামাজিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা আরও বিস্তৃতভাবে পৌঁছানো হচ্ছে। এই বহুমুখী প্রচেষ্টা সাধারণ জনগণকে দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। ফলশ্রুতিতে, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ হিসেবে কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ নয় বরং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী ও সমুদ্রের এই মূল্যবান সম্পদ আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, জীবনযাত্রা ও জেলেদের জীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই ইলিশ সংরক্ষণ শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি সকলের দায়িত্ব। সরকার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, জেলে সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণকে একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে। একসাথে কাজ করলে ইলিশ সম্পদ টেকসইভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

বলি, তখন একই সময়ে একাধিক জনের সঙ্গে আলাপ হয়।তখন আর মনোযোগ একমুখী থাকে না।একই সময়ে চিন্তাশক্তি এবং মনোযোগও ভাগ হয়ে যায়।এতে আলাপের গুরুত্বও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসে ।কারও কারও জীবনে এই ভার্চুয়াল প্রেমই পরিণত হয়েছে স্থায়ী দাম্পত্যে। তাই প্রযুক্তি যেমন দূরত্ব কমিয়েছে, তেমনি ভালোবাসার নতুন এক অধ্যায় তৈরি করেছে।কিন্তু এই ভালোবাসার ভেতরেই লুকিয়ে আছে ভঙ্গুরতা। বাস্তবে দেখা না হওয়ায় অনেক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে কেবল কল্পনার ওপর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাজানো হাসি, এডিট করা ছবি আর অল্প কিছু কথোপকথন দিয়েই তৈরি হয় এক পৃথিবী। অথচ বাস্তবে সেই পৃথিবী হয়তো একেবারেই আলাদা। তাই সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতেই সম্পর্ক ভেঙে যায়, এক নিমিষে হয়ে যায় ব্লক কিংবা আনফ্রেন্ড।এই ধরনের ভার্চুয়াল সম্পর্ক খুব বেশি দৃঢ় হয় না।দীর্ঘদিন একসঙ্গে পথচলাও সম্ভব হয় না.তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ভার্চুয়াল ভালোবাসাকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পড়াশোনা, পরিবার কিংবা নিজের ভবিষ্যতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সেই সম্পর্ক। আবার এমনও আছে যারা কেবল সময় কাটানোর জন্য সম্পর্ক গড়ে তোলে, আর অন্যজন ডুবে যায় মানসিক আঘাতে।

তাহলে কি ভার্চুয়াল ভালোবাসা মিথ্যে? আসলে ভালোবাসা মিথ্যে হয় না কখনো। মিথ্যে হয় মানুষ, যদি সেখানে না থাকে সততা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। ভালোবাসা যদি আন্তরিক হয়, তবে সেটা ভার্চুয়াল হোক বা বাস্তব—দুই জায়গাতেই সমান সত্য। শুধু ইমোজি পাঠালেই সম্পর্ক টেকে না; আবার দেখা না করেও হৃদয়ের গভীর টান তৈরি হতে পারে, যদি দুইজন মানুষ সত্যিই একে অপরকে গুরুত্ব দেয়।

আজকের এই ডিজিটাল যুগে ভালোবাসা হয়তো অনেকটাই ভার্চুয়াল হয়ে গেছে—এটাই সময়ের নিয়ম। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা আমাদের সবার জন্য রয়ে গেল—আমরা কি সত্যিই ভালোবাসছি, নাকি কেবল স্ক্রিনের আলোয় তৈরি করছি এক ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা?

লেখক: কবি ও উদ্যোক্তা।

শিশুর সুরক্ষায় টাইফয়েড ভ্যাকসিন

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ আর তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা জাতির অগ্রযাত্রার মূল ভিত্তি। কিন্তু এখনও দেশে টাইফয়েডের মতো পানিবাহিত সংক্রমণজনিত রোগ শিশুদের জন্য এক ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি হয়ে রয়েছে। দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই রোগ প্রতিবছর হাজারো শিশুকে অসুস্থ করে তোলে এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। এ বাস্তবতায় শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগ শিশু সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের এক অনন্য পদক্ষেপ।

স্কুলের বাইরের খাবারগুলোর মধ্যে যেমন ফুচকা, ভেলপুরি, চটপটি, আচার, শরবত বা আইসক্রিম — এগুলোর টক-মিষ্টি ও ঠান্ডা খাবার বাচ্চাদের মধ্যে পানিবাহিত রোগের অন্যতম কারণ। বিশেষ করে টাইফয়েড সংক্রমণ শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। খাওয়ার আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত না ধুলে দূষিত পানি ও খাবার খেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্য অনুযায়ী, টাইফয়েড হলো স্যালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি সিস্টেমিক সংক্রমণ, যা সাধারণত দূষিত খাদ্য বা পানি গ্রহণের মাধ্যমে ছড়ায়। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, মাথাব্যথা, বমিভাব, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া। এসব উপসর্গ প্রায়ই অস্পষ্ট হয় এবং অনেক সময় অন্যান্য জ্বরজনিত রোগের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। গুরুতর অবস্থায় জটিলতা বা মৃত্যুও ঘটতে পারে। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির অভাব টাইফয়েডের প্রকোপ বাড়ায়। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৯০ লাখ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই রোগ থেকে বাঁচার উপায় হলো বাসায় রান্না করা খাবার খাওয়া, পানি ফুটিয়ে খাওয়া এবং বাসি খাবার পরিত্যাগ করা।

টাইফয়েড ভয়াবহ রূপ নিতে পারে যদি চিকিৎসা করতে দেরি করা হয়। এই টাইফয়েড হলো নাড়িতে ঘা বা অন্ত্রে ঘা; যার ফলে আস্তে আস্তে নাড়িটা ফুটো পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, তখন সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে। আবার লিভারে কিন্তু এটার প্রদাহ ছড়িয়ে যেতে পারে তখন

লিভারের এনজাইম বেড়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় হেপাটাইটিস। আবার অগ্নাশয়ে এটার প্রদাহ ছড়িয়ে যেতে পারে তখন এটাকে বলা হয় প্যানক্রিয়াটাইটিস। এছাড়া গলব্লাডার বা পিত্তথলিতে প্রদাহ ছড়িয়ে যেতে পারে তখন এটাকে বলা হয় কোলেসিস্টাইটিস। এমনকি ফুসফুসে এটার প্রদাহ হতে পারে তখন এটা হতে পারে নিউমোনিয়া। আবার হার্টে এটার প্রদাহ ছড়িয়ে গিয়ে মায়োকারডাইটিস হতে পারে। সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা ব্রেনে যদি প্রদাহ শুরু হয়, হতে পারে মেনিনজাইটিস, এনক্যাফালাইটিস, এনক্যাফালোপ্যাথি এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কাজেই কোনোভাবেই এত বড়ো রিস্ক নেয়া ঠিক না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বর্তমানে টাইফয়েড জ্বর নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় ও প্রাদুর্ভাব উভয় পরিস্থিতির জন্য তিন ধরনের ভ্যাকসিন সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (টিসিভি) সব বয়সের জন্য রুটিন টিকাদান কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে কারণ এটি উন্নত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। এটি কম বয়সি শিশুদের জন্য উপযোগী এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা প্রদান করে।

শিশুর সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের বহুমুখী পরিকল্পনার একটি নজির শিশুদের বিনামূল্যে টাইফয়েডের টিকা দান কর্মসূচি। এক ডোজ টিকা নিয়ে টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধ করা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকার আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫ হতে সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। প্রথমবারের মতো সরকার প্রায় ৫ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে এই টিকা দেবে। ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সব শিশু এই ভ্যাকসিনের আওতায় আসবে।

টিকা পেতে https://vaxepi.gov.bd/registration/tcv এ অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন হবে ১৭ সংখ্যার জন্ম নিবন্ধন সনদের নম্বর। বাচ্চা কোন স্কুলে, কোন ক্লাসে পড়ালেখা করে সেটা লাগবে। নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১ আগস্ট থেকে। নিবন্ধনের পর জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যবহার করে সরাসরি ভ্যাকসিন কার্ড ডাউনলোড করা যাবে। ১২ অক্টোবর থেকে টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে। যারা রেজিস্ট্রেশন করবে প্রত্যেককে দিন ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ভ্যাকসিন দিতে হবে। যদি বাচ্চা অসুস্থ থাকে অথবা যদি কোনো কারণবশত সেদিন ভ্যাকসিন না নেওয়া যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, পরবর্তীতে বাচ্চা সুস্থ হলে তার যেকোনো একদিন বাচ্চার স্কুলে বা যেখানে টিকাদান কর্মসূচি চলছে সেখানে গিয়ে টিকা দেওয়া যাবে। প্রথম ১০ দিন স্কুল ও মাদ্রাসায় ক্যাম্পের মাধ্যমে এবং পরবর্তী ৮ দিন ইপিআই সেন্টারে

সফল করে তুলতে। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রতিটি শিশুকে টাইফয়েড ভ্যাকসিনের আওতায় এনে একটি সুস্থ, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধদফতর।

পুষ্টি গুণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় ডিমের গুরুত্ব

বিশ্ব খাদ্যব্যবস্থায় প্রোটিন অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। এ ক্ষেত্রে ডিমকে বলা হয় সবচেয়ে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর উৎস।

মানবজাতির সুস্বাস্থ্য, শিশুর বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশে ডিমের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিমকে বিশ্বে একটি উন্নতমানের ও সহজলভ্য আমিষজাতীয় খাদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এগ কমিশন (আইইসি) গঠিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৮০। সংস্থাটি প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রথম ‘বিশ্ব ডিম দিবস’ আয়োজন করে, যা পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব ডিম দিবস। এ বছর বিশ্ব ডিম দিবসের প্রতিপাদ্য “শক্তিশালী ডিম- প্রাকৃতিক পুষ্টিতে ভরপুর”- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল (বিপিআইসিসি) এবং ওয়াপসা-বিবি যৌথভাবে বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৫ পালন করছে। বিশ্ব ডিম দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো- বিশ্বজুড়ে মানুষকে ডিমের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতন করা, সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের প্রোটিন ও অপরিহার্য পুষ্টি সরবরাহে ডিমের ভূমিকা তুলে ধরা এবং সব বয়স ও শ্রেণির মানুষের খাদ্য তালিকায় ডিমকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।